চাষবাস

আবহাওয়া

১০ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রযোজ্য আগাম আবহাওয়া বার্তা ও কৃষি উপদেষ্টা:

আগামী দিনগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০.৫ থেকে ২৩.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.০ থেকে ১৪.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। আগামী পাঁচ দিন আকাশ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা। সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০ থেকে ৮২ শতাংশ এবং বিকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪১ থেকে ৫২ শতাংশ থাকতে পারে। বাতাস ৭ থেকে ১২ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বইতে পারে।

ডাকবাক্স

চিঠি পাঠান: চাষবাস
২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭২
নাম ও ঠিকানার সঙ্গে ই-মেল
chashbas@sangbadpratidin.in

বিপন্ন মৎস্যকুল

বর্তমানে কিছু লোভী মানুষের জন্য প্রায় সব নদীই মাছ-শূন্য হতে চলেছে। খাল, বিল জলাশয়ের মাছও বিপদের মুখে। হারাতে বসেছে উল্কো, চ্যাং, চেলা, পুঁটি, সরপুঁটি, মৌরলা, চুনো, বাটা, বেলে, শোল, ল্যাঠা, পিয়ালি, কুচো চিংড়ি, বান, বউ, বোয়াল, বোরলি, কুঁচে, ছোট পাঁকাল, ন্যাদোস, খলিসার মতো মাছও বিলুপ্তির পথ ধরেছে। লিখেছেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের গবেষক অন্তরা মহাপাত্র ও বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন-বরিষ্ঠ গবেষক ড. পরিতোষ বিশ্বাস।

মৎস্য ধরিব, খাইব সুখে

নদীর ধারের মৎস্যজীবীরা এক সময় বাপ-ঠাকুর্দার মুখে এই কথা শুনতেন। কিন্তু এই প্রবচন এখন আর চলছে না। নদীতে মাছ না পাওয়াতে মৎস্যজীবীরা বাধ্য হচ্ছেন অন্য পেশায় যেতে। কেউ বা দিনমজুর, কেউ বা শ্রমিক। কেউ কেউ অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন কাজের খোঁজে, পেটের দায়ে। পরিযায়ী শ্রমিকের দলে নাম লেখাচ্ছেন। অনিশ্চিত জীবন।

নদীর মাছ ধরলে ট্যাক্স দিতে হবে। বৃটিশ সরকার এই আইন চালু করেছিল। তখনকার কলকাতা অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা বিপদে পড়ে রানী রাসমণির শরণাপন্ন হন। তিনি মোটা টাকা দিয়ে গঙ্গা নদীর সব মাছ ধরার অধিকার নেন। দলিলে লিখে নেন, তাঁর মাছ চাষে কেউ যেন অসুবিধার সৃষ্টি না করে। তারপর তিনি লোহার শিকল গঙ্গার উপর বেঁধে দেন। বৃটিশ সরকারের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেন। কারণ, তাঁর মাছ চাষে ক্ষতি হচ্ছে। কূটনৈতিক চালে বৃটিশ সরকার বিপদে পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে রানী রাসমনির শর্তে রাজি হয়ে শুধু গঙ্গা নয়, ভারতবর্ষের সব নদী থেকে মাছ ধরার উপর ট্যাক্স নেওয়া বন্ধ করে দেয়।। সেই আইন এখনও চলছে।

বর্তমানে কিছু লোভী মানুষের জন্য প্রায় সব নদীই মাছ-শূন্য হতে চলেছে। যেমনঃ ইছামতী, সোনাই, পিয়ালী, কাটাখালি, সরস্বতী, যমুনা, পদ্মা, বিদ্যাধরী, ওয়ালি, কটকুন্তি, আত্রেয়ী, ব্রাহ্মণী, পুনর্ভবা, টাংগন, তিস্তা, দরিয়া, সেনজাজন, রায়ডাকি, ধারিস, দৌলা, তুরতুরী, সিনাই, কাঁসাই, ভৈরব, জলঙ্গী, দামোদর, অজয়, দ্বারকেশ্বর, প্রভৃতি। মৎস্যজীবীরা আবার বিপদের সামনে। জীবিকায় টান পড়েছে। বাঙালীর পাতে আজ মাছ বাড়ন্ত হতে বসেছে। অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরশীল। রাজ্যের কষ্টের আয় করা টাকা, অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। খুবই দুঃখের কথা!

নদীর হারানো মাছ

সুস্বাদু ইলিশ মাছ সহ আরও অনেক মাছ। যেমনঃ উল্কো, চ্যাং, চেলা, পুঁটি, সরপুঁটি, পেট কাটা লাল পুঁটি, মুখ পোড়া পুঁটি, মৌরলা, চুনো, বাটা, বেলে, কুল্লী ট্যাংরা, কুচো ট্যাংরা, বড় ট্যাংরা, রায়ঘর, শোল, ল্যাঠা, পিয়ালী, হন্যে চিংড়ি, মোচা চিংড়ি, চামটে চিংড়ি, কুচো চিংড়ি, বান, বউ, বোয়াল, বোরলি, কুঁচে, ছোট পাঁকাল, বড় পাঁকাল, বাছা, ডারাংগি, খোকা, কই, ন্যাদোস, খলিসা, মাগুর, সিঙ্গি, লয়টা, ভোলা বাওয়ালী, মহাশোল, পাথরঘরিয়া, কালবোম, কাঁসকেল, তাড়ুই, চিতল, পুলা, বাঘের, পীটকাটা, মৃগেল, রুই, কাৎলা, গুলে, দাঁড়কেক, ত্রিচোখা, তোপসে, খয়রা, ফ্যাঁসা, কাঁচকি, ইত্যাদি।

মাছের ক্ষতি কিভাবে

১) বিষ দিয়ে মাছ ধরা: বিষ প্রয়োগে মাছ ধরলে তা মাছের যেমন ক্ষতি করে তেমনই মানুষের জন্যেএবং পরিবেশের পক্ষেও ক্ষতিকারক।

(২) বিস্ফোরক ফাটিয়ে মাছ ধরা: উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা বা ডিনামাইট জলে ফটিয়ে মাছ ধরার ফলে এই বিস্ফোরণে মাছের পটকা ফেটে গিয়ে মাছ মরে যায় এবং জলের উপর ভেসে উঠে।

(৩) ঘন-জালে মাছ ধরা: ঘন বা সূক্ষ্ম ফাঁসের জাল দিয়ে মাছ ধরলে ছোট-বড় সব মাছ ধরা পড়ে। কেউ বাদ যায় না। মাছেরা সবংশে মারা পড়ে। বংশে বাতি দিতে কেউ থাকে না।

(৪) সেচে মাছ ধরা: সেচ দিলে পুকুরের জল শুকিয়ে যায়। কোনও মাছের পক্ষে কাদায় লুকিয়ে থাকা সম্ভব হয় না। পুকুর মাছ-শূন্য হয়ে যায়। পরবর্তী বছরে মাছ আর জন্মায় না।

(৫) জলের দূষণ: শহর বা কারখানার বর্জ্য-দূষিত পদার্থ নদীতে পড়ার ফলে জল দূষিত হয়ে যায়। ফলে, মাছ আর জন্মাতে পারছে না।

(৬) নদীর বুকে নির্মাণ: রাস্তা বা রেল লাইনের জন্য নদীর বুকে নির্মাণ হচ্ছে। কংক্রিট বা অন্যান্য জিনিস নদীতে জমা হচ্ছে। মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধা পাচ্ছে। নদী মাছ শূন্য হয়ে যাচ্ছে।

(৭) চাষের কীটনাশক: চাষের জমিতে কীটনাশক বা আগাছানাশক প্রয়োগ করলে মাটির জলে ধুয়ে ওই কীটনাশক নদীতে বা জলাশয়ে এসে জমা হয়। মাছের ক্ষতি হয়। নদী বা জলাশয়গুলি মাছ- শূন্য হয়ে যায়।

(৮) নদী-চুরির সমস্যা: লোভী মানুষ আবর্জনা, মাটি, বালি ফেলে ডোবা, পুকুর, খাল, নদী সব ভরাট করে ঘর-বাড়ি করছে। জলের এলাকা কমে যাচ্ছে। নদী ও জলাশয় গুলি মৎস্য-বিহীন হয়ে যাচ্ছে। অনেক নদী আজ অবলুপ্তির পথে। যেমন: আদি গঙ্গণ, ইছামতী, সোনাই, পিয়ালী, কাটাখালি, সরস্বতী, যমুনা, পদ্মা, বিদ্যাধরী, ওয়ালি, কটকুন্তি, ইত্যাদি।

(৯) রোগ সমস্যাঃ খাল, বিল, পুকুর বা নদীতে মাছেরা স্বাভাবিক পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে না। ফলে মাছেরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মাছ মরে যাচ্ছে। আমরা মাছ পাচ্ছি না।

সমাধান সূত্রঃ

১) অজ্ঞ মৎস্যজীবীদের বোঝানো।
২) নিয়ম পালনকারীদের উৎসাহ দেওয়া ও পুরুস্কৃত করা।
৩) নদীর জল দূষণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।
৪) অবৈধভাবে মাছ ধরা, বিষ প্রয়োগ, বিস্ফোরক, সেচ, জল দূষণ, ঘন জাল ব্যবহার বন্ধ করা।
৫) নিয়মভঙ্গকারীদের কঠিন শাস্তি দেওয়া।
৬) নদী-খাল-বিলে প্রচুর পরিমাণে মাছের বীজ পোনা ও শিশু মাছ ছাড়তে হবে। যাতে নতুন প্রজন্মের নতুন মাছ আবার জন্মায়।

সুপারফুড মিলেট

মিলেট গ্লুটেন-মুক্ত, ডায়েটারি ফাইবার সমৃদ্ধ এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে ভরপুর। মিলেট বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে গভীর ভাবে গেঁথে আছে। বাজরা ভিত্তিক খাবার, যেমন বাজরা ভাজা, বাজরা পরোটা এবং বাজরার পায়েশ, বাজরা পুডিং, রুটি, প্যানকেক এবং এমনকি অ্যালকোহল যুক্ত পানীয় সহ বিভিন্ন খাবারে ব্যবহার করা যেতে পারে। বৈচিত্র্যময় পরিবেশগত পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠার ক্ষমতা রয়েছে, এমনকী, কম বৃষ্টিপাত এবং কম উর্বর মাটিতেও এটি চাষ করা যায়। তাই মিলেট জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি অন্যতম অপরিহার্য ফসল হিসাবে পরিচিত। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্য বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক সুস্মিতা মঈ এবং অধ্যাপক বিকাশ চন্দ্র পাত্র।

প্রথম পর্ব

বাংলায় বাজরা নামে পরিচিত মিলেট। এটি বাংলার সমৃদ্ধ খাবার-দাবারে ঐতিহ্য এবং একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রয়েছে। এই বাজরা চাষ হাজার হাজার বছর আগের। প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান গুলিতে এর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ভাবে, বাজরা ছিল বাংলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা চাষ করা এবং খাওয়ার প্রধান শস্য গুলির মধ্যে একটি।

জোয়ার, বাজরা, রাগি সহ কয়েকটি মোটা দানার খাদ্য-শস্যের (মিলেট) উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই শ্রেণি ভুক্ত শস্য গুলির পুষ্টির মাত্রা অনেক বেশি এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী। ২০২৩ সালকে 'ইন্টারন্যশনাল ইয়ার অব মিলেট' বলে ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। পশ্চিমবঙ্গে মিলেট চাষের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এই চাষ বেশি হয় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে মিলেটের মোট উৎপাদন হয় ৪৬ হাজার টন। পরিমাণটি দেশের মোট উৎপাদনের তুলনায় খুবই কম। মিলেট উৎপাদনে ভারতই এক নম্বরে। এদেশে বছরে মিলেট হয় মোটামুটি ২ কোটি টন। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে এই শস্যের উৎপাদন অনেক বেশি। সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয়েছে রাজস্থানে (৫৮ লক্ষ টন)। ইতিমধ্যেই সরকারি সহায়তায় মিলেট শস্যের উৎপাদন বেড়েছে তরতরিয়ে। পাশাপাশি লাভের অঙ্কও বেড়েছে। ২০১৫-১৬ সালে প্রতি টন ১৪.৫২ শতাংশ থেকে ২০২০-২১ সালে হার বেড়েছে টন প্রতি ১৭.৯৬ শতাংশ। ২০২০ সালের তথ্য অনুসারে ৫ বছরে ভারতের বাজরা উৎপাদনে প্রায় ৩% ধারাবাহিক বৃদ্ধি হয়েছে।

মিলেট চাষ এই রাজ্যের অনেক চাষির পক্ষেই বেশ লাভজনক হতে পারে। জলাভাব যুক্ত অনুর্বর উঁচু জমিতে মিলেট চাষ হয়ে থাকে। সেই হিসেবে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি মিলেট চাষের আদর্শ জায়গা। এখন অল্প কিছু চাষি নিজেদের উদ্যোগে মিলেটের চাষ করেন। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করলে উৎপাদনের হারও বাড়বে। খরিফ মরশুমে বৃষ্টির স্বল্পতার কারণে অনেক জমিতে ধানচাষ করাই যায় না। কিন্তু সেখানে মিলেটের চাষ সম্ভব। এক সময় জোয়ার, বাজরা, রাগি প্রভৃতি শস্যকে গরিবের খাদ্য বলে মনে করা হতো। সেই ধারণা পাল্টে এগুলি 'সুপার ফুডের' তকমা পেয়েছে।

তাই এই শস্যের দাম অনেকটাই বেড়েছে। চাহিদা বাড়ছে দেশ ও বিদেশে। তাই অদূর ভবিষ্যতে মিলেট চাষ করে চাষিদের লাভ বাড়বে।

কেন মিলেট সুপারফুড হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে?

সাম্প্রতিক বছর গুলিতে, বাজরা তার ব্যতিক্রমী পুষ্টি প্রোফাইল এবং স্বাস্থ্য সুবিধার কারণে একটি সুপারফুড হিসাবে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কেন বাজরা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে:বাজরা খাওয়ার ফলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়।

তার মধ্যে কিছু মূল সুবিধা হল:

পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ: বাজরা, একটি গ্রুপ হিসাবে, বিভিন্ন পুষ্টির সুবিধা প্রদান করে। এগুলি ডায়েটারি ফাইবার সমৃদ্ধ, যা হজমে সহায়তা করে, তৃপ্তি বাড়ায় এবং স্বাস্থ্যকর কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখতে সহায়তা করে। বাজরা উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিনের একটি ভাল উৎস। এছাড়া বাজরায় লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাসের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের সাথে নিয়াসিন, থায়ামিন এবং ভিটামিন বি ৬ সহ বিভিন্ন ভিটামিন রয়েছে। এটি পুষ্টির একটি স্বাস্থ্যকর প্যাকেজ সরবরাহ করে।

প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ: বাজরাতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা শরীরকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগ এবং নির্দিষ্ট ধরণের ক্যানসার সহ দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমায়। ফল বা সবজির মধ্যে যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান থাকে, তার সমপরিমাণে থাকে বাজরায়ও। তাই ফল খেলে যে উপকার হয়, তা আমরা সমানভাবে পেতে পারি বাজরা থেকেও। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে এবং সংক্রমণ ও রোগ থেকে রক্ষা করে।

হজমশক্তি বাড়ায়: বাজরাতে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটরি ফাইবারের উপস্থিতি পাচনতন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, ফোলা ভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করে এবং লিভার, কিডনির মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ গুলি ভাল রাখে। এছাড়াও বাজরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অত্যন্ত সহায়ক।

স্থিতিশীল রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখে: বাজরায় একটি কম গ্লাইসেমিক সূচক রয়েছে, যার অর্থ তারা ধীরে ধীরে রক্ত প্রবাহে গ্লুকোজ ছেড়ে দেয়। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বেশ উপকারী।

হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখে: মিলেট বা বাজরাতে থাকা ফাইবার উপাদান এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপস্থিতি স্বাস্থ্যকর কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখতে এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমাতে অবদান রাখে।

ওজন কমাতে সাহায্য করে: অতিরিক্ত ওজন কমাতে সাহায্য করে বাজরা। তাই যাদের ওজন খুব বেশি তারা দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মিলেট রাখতে পারেন। গমের পরিবর্তে মিলেট বা বাজরার আটা দিয়ে তৈরি রুটি খেতে পারেন। প্রতিদিন ভাতের বদলে বাজরা দিয়ে তৈরি খাদ্য খেতে পারলে তা চর্বি জমা কম করতে সাহায্য করে, অন্ত্র ভাল রাখে। বাজরার আটা গ্লুটেন ফ্রি এবং ফাইবার, ম্যাগনেশিয়াম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ। আর এই সব পুষ্টিকর উপাদান খিদে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের শরীরে অতিরিক্ত ক্যালোরি জমা হতে দেয় না। ফলে ওজন কম করা সম্ভব হয়।

বাচ্চাদের জন্য উপকারী: ছয় মাস বয়সের পর থেকে নিয়মিত মিলেট খেলে বাচ্চার হাড় শক্ত হয়, দৈহিক গঠন বৃদ্ধি পায়, ওজন ঠিক থাকে এবং পরিপাকতন্ত্র সবল থাকে। বাজরাতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ রয়েছে যা স্বাস্থ্যকর হাড় এবং দাঁতের গঠনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আটার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার: মিলেটের রুটি আটার রুটির চেয়ে বেশি পুষ্টিকর ও উপকারী। বাজরায় আয়রন ও এনার্জির পরিমাণ আটার তুলনায় বেশি। পাশাপাশি ক্ষতিকর কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম। এ ছাড়া এতে আছে প্রোটিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড, যা আমাদের দেহ গঠন ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে: গম এবং ভুট্টার তুলনায় বাজরা থেকে বেশি পরিমাণে পুষ্টি মেলে। এটি গ্লুটেন-মুক্ত এবং কম গ্লাইসেমিক সূচক। এতে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ থাকে, ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তাই বাজরা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য।

ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে: বাজরা বিভিন্ন টিস্যুতে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি আটকাতে পারে। বাজরায় থাকা ফাইটোকেমিক্যালস সাধারণ কোষগুলির কোনও ক্ষতি না করেই কোলন, স্তন এবং লিভারে 'অ্যান্টিপ্রোলিফেরাটিভ' প্রভাব এবং কম ক্যানসার কোষের গঠনে সাহায্য করে।

টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধব: বাজরা তার স্থিতিস্থাপকতা এবং বিভিন্ন জলবায়ু অবস্থার সাথে অভিযোজন যোগ্যতার জন্য পরিচিত। অন্যান্য প্রধান খাদ্যশস্যের তুলনায় এর জন্য কম সম্পদের প্রয়োজন, যেমন জল এবং সার। বাজরা চাষ এবং খাওয়া টেকসই কৃষি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারে।

নগর বাঁচাবে উদ্যানপালন

উদ্যানপালন শহরের জীববৈচিত্র বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষ, স্থানীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুল এবং ফল বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক তনুশ্রী কোলে এবং রাজদীপ মোহন্ত।

শেষ পর্ব

অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ

ভুমিকা: অফিস, বাড়ি এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ এলাকায়, খারাপ বায়ুর গুণমান উভয়ই স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ এখন জনস্বাস্থ্যের জন্য শীর্ষে থাকা পাঁচটি হুমকির একটি হিসাবে স্থান পেয়েছে। এটি রাসায়নিক বাষ্পের মুক্তি এবং ধুলো এবং অণুজীবের মতো কণার বাতাসে নিলম্বনের ফলে হয়। ক্রমবর্ধমান শক্তি খরচ এবং শক্তি সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, বিল্ডিং এবং বাড়িগুলি আরও শক্তি দক্ষ হওয়ার জন্য নকশা করা হয়েছে। এইভাবে, অনেক অফিস এবং নতুন বাড়ি আঁটোসাঁটো ভাবে নির্মাণ করা হয়ে থাকে, বাইরের বাতাস থেকে বিল্ডিংকে সিল করে। এভাবে এটি অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণকে একটি বিপজ্জনক স্তরে নিয়ে আসাকে আরও সহজ করে তোলে। লোকজন তাঁদের ৭০-৯০% পর্যন্ত সময় বাড়ির অভ্যন্তরে ব্যয় করেন, অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণের দীর্ঘমেয়াদী প্রকাশ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

প্রভাব: বায়ু দূষণ যেকোনও সীমিত স্থানে বাড়তে পারে, তবে অফিস এবং বাড়ি তৈরি বা সজ্জিত করার জন্য আজকাল ব্যবহৃত সিন্থেটিক উপকরণ থেকে গ্যাসগুলি 'সিক বিল্ডিং সিন্ড্রোম' হতে পারে। যাঁরা দূষণকারীর প্রতি অতি সংবেদনশীল তাঁরা চোখ, নাক এবং গলার জ্বালা, অ্যালার্জি, হাঁপানি, ঝাপসা দৃষ্টি, মাথা ঘোরা, ক্লান্তি, মাথাব্যথা এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্র এবং সাইনাস সহ গুরুতর লক্ষণগুলি বিকাশ করতে পারে।গৃহস্থালীর পণ্য এবং রাসায়নিক দ্রব্য যা অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ ঘটায় তার মধ্যে রয়েছে আসবাবপত্রের মোম, পেইন্ট স্ট্রিপার, পরিষ্কারের পণ্য, জীবাণুনাশক, ডিগ্রিজার এবং প্রসাধনী। এই পণ্যগুলির মধ্যে কিছু ব্যবহারের সময় বাতাসে রাসায়নিক দ্রব্য ছেড়ে দেয়, অন্যরা বয়সের সাথে সাথে, শুকনো বা নিরাময় করার সাথে সাথে রাসায়নিক দ্রব্য নির্গত করতে থাকে;এটি আউট-গ্যাসিং হিসাবে পরিচিত।

প্রতিকার: অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ কমাতে এবং বায়ুর গুণমান উন্নত করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। বাইরের সাথে বায়ু চলাচল এবং বায়ু বিনিময় বৃদ্ধি করে বাড়ির ভিতরে জমে থাকা বায়ু দূষণকারীর পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। রান্নাঘর এবং বাথরুমে নিষ্কাশন ফ্যান স্থাপন করা করা যেতে পারে এবং কার্বন ফিল্টার উপাদানযুক্ত উচ্চ-দক্ষতার বায়ুর কণা ফিল্টারগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণে অন্দর বা গৃহমধ্যস্থ গাছের ভূমিকা:

• গাছপালা বাতাস থেকে উদ্বায়ী জৈব যৌগগুলিকে তাদের পাতায় শোষণ করে এবং তারপরে তাদের মূল অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে, যেখানের জীবাণুগুলি সেই যৌগগুলিকে ভেঙে দেয়। এই সব দূষণকারী যৌগ মাটিতে উপস্থিত অণুজীবের খাদ্য উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বায়ু থেকে উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত কিছু জৈব রাসায়নিক উদ্ভিদের নিজস্ব জৈবিক প্রক্রিয়া দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়।

• গাছপালা অভ্যন্তরীণ স্থানগুলিতে নান্দনিক এবং জৈবিক আরাম যোগ করে। যখন গাছপালা ঘরে রাখা হয়, তখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়তে পারে এবং কণা পদার্থ (ধুলো) জমে কমতে পারে।

শহুরে এলাকায় ঘর বা ঘরের সৌন্দর্যায়ন: ঘরোয়া পাতাবাহারি গাছ রোপণ করে ঘরের সৌন্দর্যায়ন করা যেতে পারে। ফল বা ফুলের পরিবর্তে আকর্ষণীয় পাতার জন্য আকর্ষণীয় সমস্ত গাছপালা লাগিয়ে ঘরের সৌন্দর্যায়ন করা যেতে পারে। এই গাছগুলির বেশিরভাগই তাদের আকর্ষণীয় পাতা অথবা ফুলের সাথে বাড়ির ভিতরে বৃদ্ধি পেতে সক্ষম। পাতার গাছ, সাধারণ পরিভাষায়, ঘরের উদ্ভিদ বলা হয়।

বংশবিস্তার: বাড়ির গাছপালা বিভিন্ন উপায়ে প্রচার করা যেতে পারে। ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলিকে যৌন (বীজ বা স্পোর) বা অযৌন (উদ্ভিদগত) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, পরবর্তীতে বিভাজন এবং পৃথকীকরণ, গ্রাফটিং এবং বাডিং, লেয়ারিং এবং বিভিন্ন ধরণের কাটিংয়ের মতো কৌশলগুলি জড়িত।

গৃহমধ্যস্থ উদ্ভিদের জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরি করা:

পুনঃ-পটিং: স্থিতিশীল বৃদ্ধি এবং প্রাণশক্তি বজায় রাখার জন্য সমস্ত পাত্রযুক্ত গাছগুলিকে বছরে অন্তত একবার পুনরায় অন্য পাত্রে স্থানান্তরিত করা দরকার।

তাপমাত্রা: শীতকালে যখন আলো কম থাকে তখন প্রয়োজনীয় উচ্চ তাপমাত্রার দ্বারা গাছের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করা যায়, যেখানে গ্রীষ্মকালে প্রয়োজনীয় উচ্চ আর্দ্রতার সাথে গাছগুলিকে সূর্যালোকের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

আলো এবং ছায়া: উদ্ভিদের সর্বোত্তম অবস্থা হল ভাল সূর্যালোকের উপস্থিতি কিন্তু সরাসরি সূর্যালোকের বাইরে। সাধারণত বাইরে রাখা গাছগুলি এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে সূর্যের রশ্মিগুলি একটি কাঁচের বা একটি নেট পর্দার মধ্য দিয়ে যাবে যাতে এটি সূর্যের রশ্মির সাথে সরাসরি সংস্পর্শে না আসে। শুধুমাত্র মরুভূমি এবং স্টেপার ইত্যাদির গাছগুলি সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখা উচিত।

আর্দ্রতা: এটি গৃহমধ্যস্থ উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাত্রের গাছটিকে জল দিয়ে নুড়ির উপর রেখে এটি বাড়ানো যেতে পারে। গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন ঝরা পাতার গাছের মিস্টিং করা উচিত।

প্রতিপালন: গাছগুলিকে নিয়মিত ভাবে প্রতিপালন করা উচিত যখন তারা সক্রিয়ভাবে বেড়ে উঠছে। সাধারণত বসন্তের মাঝামাঝি এবং শরতের মাঝামাঝি হল গাছের বৃদ্ধির সেরা সময়। সার বিভিন্ন প্রকারের হয় যার মধ্যে রয়েছে তরল ফিড (এগুলি দ্রুত কাজ করে এবং যখন একটি উদ্ভিদের তাৎক্ষণিক বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তখন এটি কার্যকর হয়), বটিকা এবং টুকুরো খণ্ড (এগুলিকে কম্পোস্টের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয় এবং তারপরে তারা ধীরে ধীরে সময়ের মধ্যে পুষ্টি ছেড়ে দেয়), ধীরে ধীরে মুক্তি থলি (এটি পাত্রের নীচে রাখা হয় এবং পুনরায় পাত্র স্থানান্তরিত করার সময় দরকার হয়), দ্রবণীয় পাউডার (এগুলি তরলে দ্রবীভূত হয় এবং তরল সারের মতো ব্যবহৃত হয়), দানাদার সার (সরাসরি কম্পোস্টে যোগ করা হয় এবং কাঁটাচামচ ব্যবহার করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়)।

কম্পোস্ট: এটি পুষ্টির আধার হিসাবে কাজ করে। এটি অনেক অণুজীবের বাসা হিসাবেও কাজ করে। কম্পোস্ট মূলত দুই প্রকার যেমন দোআঁশ ভিত্তিক এবং পিট ভিত্তিক।

অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যায়ন নিম্নলিখিত উপায়ে করা যেতে পারেঃ

১) ঝুলন্ত ঝুড়ি: এটি কাঠ, প্লাস্টিক বা তারের তৈরি একটি ঝুলন্ত পাত্র যা ক্রমবর্ধমান আলঙ্কারিক গাছপালা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত ঝুড়ির মতো। ঝুলন্ত ঝুড়ি গাছ নামে পরিচিত এসব ঝুড়িকে কখনও কখনও ফ্রী স্ট্যান্ডিং ফ্রেম থেকেও ঝোলানো যেতে পারে। এক বর্ষজীবী যে গাছগুলিকে এই পদ্ধতিতে জন্মানো যায় তা হল প্যানসি, লোবেলিয়া, মিষ্টি মটর, ভারবেনা এবং বহুবর্ষজীবী গাছ যেমন হিউচেরা, গ্যালার্ডিয়া, ল্যাভেন্ডার জন্মানো যেতে পারে।

২) আধার: এগুলি বিভিন্ন আকার এবং প্রকারের হয় যা অন্দর গাছের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যবহার করা পাত্রের আকৃতি নির্ভর করে যে গাছটি লাগানো হবে তার উপর।

৩) ফুলের থলি: এগুলি বাগানের বেড়া এবং দেয়াল, গেট, রেলিংয়ের মতো স্থানে ঝুলানোর জন্য উপযুক্ত যে জায়গাগুলি সাধারাণত ঝুড়ি ঝুলানোর জন্য উপযুক্ত নয়।

৪) পাতার গাছ: এতে ফল এবং ফুলের পরিবর্তে তাদের আকর্ষণীয় পাতার জন্মানোর জন্য জনপ্রিয়। এগুলির বেশিরভাগই তাদের আকর্ষণীয় পাতা অথবা ফুলের গাছ, যা ঘরের ভিতরেও বেঁচে থাকতে ও বেড়ে উঠতে সক্ষম এবং সাধারণত ঘরের গাছ হিসাবে পরিচিত।